আধুনিক বাংলা নাটকের কথা বলতে গেলে পুরোনো যুগের পরই যাঁর কথা বা নাটক দিয়ে আলোচনা শুরু করতে হয় — আশ্চর্যের কথা তিনি একজন বিদেশী। গেরাসিম লেবেদভ। ভারতে এসেছিলেন রুশ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে। এসেছিলেন বাংলায়। তিনিই প্রথম ১৭৯৫ সালে কলকাতায় একটি মঞ্চ নির্মাণ করেন ও তাঁরই প্রযোজনায় "দি ডিসগাইজ" – ইংরাজী নাটকের একটি অনুবাদ "কাল্পনিক সংবদল" মঞ্চস্থ করেন। অবশ্য এই নাটকটির মঞ্চায়ণ সর্বোতভাবে সফল হয় গোলক নাথ দাসের অসামান্য কর্মতৎপরতায়।

এর পরেই যে নাটকগুলির কথা জানা যায় সেগুলি হ'ল 'বালিরাজার যাত্রা' ও 'নল দময়ন্তী। মঞ্চস্থ হয় ১৮২১-২২ সালে।

১৮৩১ সালে "হিন্দু থিয়েটার" স্থাপিত হয় -- প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের বদান্যতায়। তৎকালীন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা অভিনয় করে -- উত্তর রাম চরিত ও জুলিয়াস সীজার। ১৮৩৫-এ নবীনচন্দ্র বসু মঞ্চস্থ করেন সাড়াজাগানো বিদ্যাসুন্দর। এই সময় থেকেই শুরু হয় সৌখিন রঙ্গমঞ্চের যুগ। বেলগাছিয়া, জোড়াসাঁকো, পাথুরিয়াঘাটা – প্রভৃতি স্থানে বহু নাট্যমঞ্চ তৈরি হতে থাকে। তখনকার কলকাতার বাবু-কালচারের অন্যতম নিদর্শন হয়ে ওঠে সখের নাট্যাভিনয়। এরকম এক পর্ব জুড়ে সামাজিক নানা কুপ্রথা, অন্ধ-বিশ্বাস, রীতিনীতি নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক নাটকের মহড়া শুরু হয়। রামনারায়ণ তর্কালঙ্কারের বিখ্যাত নাটক – "কুলীন কুল সর্বস্ব"-এর কথা আমরা অনেকেই জানি। এরই কিছু পরে আমরা পেয়ে যাই প্রহসন-ধর্মী নাটক – মাইকেল মধুসূদন দত্তের "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ", "একেই কি বলে সভ্যতা"। এই জনপ্রিয় নাটকগুলি ছাড়াও মধুসূদনের "শর্মিষ্ঠা" ও "পদ্মাবতী" নাটক দুটিও অভিনীত হয়।

১৮৬০। দীনবন্ধু মিত্র লিখলেন — নীলদর্পণ। বিপ্লবী আবেগের এই নাটকটি এক অন্য মাত্রায় দর্শক-হৃদয় জয় করে। সমাজ জীবনে প্রভূত আলোড়ন তুলে নাটকটি রাজরোষে পড়ে – এ ইতিহাস

Scanned with CamScanner

সর্বজন বিদিত। প্রসঙ্গত বলা যায় বাংলায় সেই সুপ্রাচীণ কাল থেকেই আজ পর্যন্ত প্রতিবাদী নাটকের একটি ধারা বিপুল মানুষের মন জয় করে এসেছে এবং পাশাপাশি রক্ষণশীল সমাজ বা আচলায়তন ভাঙ্গতে না চাওয়া সমাজের কর্ণধাররা এই ধারার নাটক গুলিতে 'সেন্সারশীপে'র কাঁচি চালিয়েছেন। আজও এর ব্যতয় ঘটেনি।

দীনবন্ধু মিত্রের আরো একটি নাটক "সধবার একাদশী" সে সময়ে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। শুধু তাই নয় – এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয় গিরিশ ঘোষের সুযোগ্য নির্দেশনায় ও অভিনয়ে। বাংলা নাটকের জগতে গিরিশ-জমানার সূত্রপাত হয়।

গিরিশ ঘোষের সময় থেকেই বাংলায় অভিনেত্রী হিসাবে পুরুষেরা নয় -- মেয়েরাই এগিয়ে আসেন। নটী বিনোদিনী বা বিনোদিনী দাসীর নাম এই সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৩ সালে 'বেঙ্গল থিয়েটারের' প্রতিষ্ঠা হয়। গিরিশ চন্দ্র একটি স্থায়ী মঞ্চ পান। তাঁর – বলিদান, প্রফুল্ল, চৈতন্যলীলা প্রভৃতি নাটক বাংলার নাট্যমোদী মানুষকে এক অন্য রসে জারিত করে। নিজস্ব একটি ছন্দের প্রণেতা (গৈরিশ ছন্দ) গিরিশ ঘোষ সে সময় বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হ'ন রামকৃষ্ণ পরম-হংসদেবের আশীর্বাদ ও ভালবাসায়। গিরিশ ঘোষের মৃত্যু হয় – ১৯২২। বাংলা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটে শিশির কুমার ভাদুড়ীর। 'স্টার থিয়েটার' বাংলার - নাট্য ইতিহাসে এক স্মরণযোগ্য সফল মঞ্চ। ১৯২৫ সালে শিশির কুমারের নাট্য সম্প্রদায় - গড়ে উঠল যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা' নাটক মঞ্চস্থ করার মধ্যে দিয়ে।

গিরিশ ঘোষের যুগের পর শিশির কুমারের যুগ বাংলা নাটকের ইতিহাসে এই ভাবে চিহ্নিত করণ কতটা সঙ্গত হবে – এই জিজ্ঞাসা রেখেও বলা যায় মঞ্চ সজ্জা থেকে বেশ-বাস, উপকরণ সমস্ত কিছুতেই নতুনের হাওয়া বইয়ে দিতে পেরেছিলেন শিশির কুমার। শিশির কুমারের অভিনয় ধারায় – শরৎচন্দ্রের ষোড়শী, রমা; ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যা বিনোদের নরনারায়ণ, আলমগীর ছাড়িয়ে রবি ঠাকুরের মুক্তধারা পর্যন্ত এক বিস্তৃর্ণ সময়পর্ব বাংলা নাট্য-জগৎকে আমোদিত করে রেখেছিল। তাঁর নাট্যাবেগ হয়ত এ যুগে অনেকটাই বেক্ষাপ্পা ঠেকবে তবু তখনকার দিনে তাঁর অভিনয় রীতির যথেষ্ট বাস্তব-ভিত্তি ছিল বলেই তিনি অতখানি জনপ্রিয় হয়েছিলেন। একই সময় পর্বে আরো যে সব দিকপাল অভিনেতা স্ব স্ব 'ম্যানারিজম্' নিয়েও বাংলার নাট্য-জগতে সুপরিচিত ও জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ছিলেন তাঁরা হলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রমুখ।

একটা সময় দেখা গেল পেশাদারী রঙ্গালয়গুলির গৌরব ম্রিয়মান হতে থাকল। শিশির কুমারের শেষ জীবন অতৃপ্তি ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিল। তাঁকে শ্রীরঙ্গম ছাড়তে হয়েছিল। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা ভাল -- দু-তিন বছর আগে শিশিরকুমারের জীবন ও সেই সময়ের নাট্য-জগতের ওঠাপড়া নিয়ে কথা সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'নিঃসঙ্গ সম্রাট' নামে এক চমকপ্রদ উপন্যাস লিখেছেন –

Scanned with CamScanner

নাটকের ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুদের কাছে যা অতি আদরনীয় হবে, সন্দেহ নেই। অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, নরেশ মিত্র প্রমুখ নাট্য ব্যক্তিত্বরাও ক্রমে ক্রমে জৌলুসহীন হলেন। আসলে সারা দেশ জুড়ে হয়ত বা পৃথিবী জুড়েই তখন বিরাজ করছিল এক নিদারুণ অস্থিরতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত। তার কিছুটা প্রভাব ভারত তথা বাংলাতেও এসে পড়েছে। আগষ্ট আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর, দাঙ্গা, স্বাধীনতা-দেশভাগ-উদ্বাস্তু সমস্যা অন্যদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকার সমস্যা, রাজনৈতিক নানা সংকট আর এসবেরই প্রভাব বাংলা নাটকে এক অনিবার্য পালা-বদলের ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছিল। গড়ে উঠল ভারতীয় গণ-নাট্য সংঘ। পাশাপাশি গড়ে উঠল সম্পূর্ণ অপেশাদারী ও সৃজনশীল দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে কিছু গ্রুপ-থিয়েটারও।

১৯৪৪ — বাংলা নাটকের ইতিহাসে এক মাইল ফলক। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' — গণ-নাট্য সংঘের অভিনয়ে শিহরণ জাগালো। ১৯৪৮ এ শম্ভু মিত্র তৈরি করলেন 'বহুরূপী'। রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়', 'মুক্তধারা', 'ডাকঘর', 'রাজা', 'রক্তকরবী' — অভাবনীয় সাফল্যে মঞ্চস্থ হ'ল। শুধু রবীন্দ্র নাটকই নয় বহুরূপীর প্রযোজনায় শম্ভু মিত্রের অসামান্য নির্দেশনায় ও অভিনয়ে বহু দ্রুপদী ভাল নাটক বাংলা নাট্য-জগৎকে বিভোর করেছে। শম্ভু মিত্র ও সেই সঙ্গে তৃপ্তি মিত্র এমনই নাট্য-ব্যক্তিত্ব যাঁদের অবদান অবিস্মরণীয়। আক্ষেপের কথা শম্ভু মিত্র যার জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন সেরকম একটি জাতীয় রঙ্গালয় গড়ার স্বপ্ন তাঁর জীবদ্দশাতে অধরাই থেকে গেছে।

এই সময় থেকেই বাদল সরকারের "থার্ড থিয়েটারে"র ভাবনা একদিকে, অন্যদিকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের বহু অনুবাদ নাটক বাংলার নাট্য-অঙ্গনে আলোড়ন তুলল। বাংলা নাট্য প্রেমী দর্শকদের কাছে ব্রেখট, টেনেসি উইলিয়াম, ইউজিন. ও. নীল, টলস্টয় এবং আরো অনেকেই ঘরের মানুষের মতই পরিচিত হলেন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত সুদক্ষ অভিনেতার অকাল মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হলেও নান্দীকার, নান্দীমুখ, চেতনা, শূদ্রক, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, সংস্তব, সমীক্ষণ, নটসেনা, সমকালীন শিল্পীদল, পঞ্চম বৈদিক, চেনামুখ, চার্বাক, কৃষ্টিসংসদ, রংরূপ, চুপকথা প্রভৃতি নাট্যদল বাংলা নাটককে সমৃদ্ধির পথে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে। এরই মধ্যে তৃপ্তি মিত্র নতুন করে আরব্ধ নাট্য বিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েদের নিয়ে করেছেন 'রক্তকরবী'। নাট্যমোদী দর্শক ফিরে পেয়েছে তাঁর 'অপরাজিতা' নতুন ক'রে।

Scanned with CamScanner